



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

শান্তিপূর্ণ সামাজিক সহাবস্থানের শর্তরূপে প্রথম যোগাঙ্গ 'যম': একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

Dr. Papia Gupta

Professor, Department of Philosophy and the Life-world,
Vidyasagar University, Midnapure.

Abstract

Yoga can be accepted as the foundation of 'Vasudhaiva Katumbakam', the idea of tying the whole world into a single thread of kinship, of living together peacefully as a global family, regardless of caste, religion, gender, culture etc, the root of which embedded in Indian culture and the theoretical as well as practical teaching of yoga that has been considered as a well-accepted holistic method in this regard. Derived from the Sanskrit root 'yuj', yoga means the union of the individual consciousness with the universal consciousness. It is not only some physical exercises for breathing procedures but also a scientific method of developing the infinite power and potential that already exist within the human mind and soul. Another meaning of the word 'yoga' is harmony, just as when all of the strings of a veena are property blended and coordinated, a heavenly tone emerges from that, so through the coordination of physical and mental actions, the overall self-realization of a person is emerged and that self-realization is gradually transmitted to all beings of this universe.

This article has taken an attempt to sketch a brief outline of the concept of 'Yama', the first limb of astānga yoga sadhana depicted by Maharsi Patanjali, as a vital Key concept, following or practicing which, the sense of morality be revealed in its fullest form in man and nurture a non-violent happy, peaceful togetherness in the society.

Key words: Yoga, Yama, morality, peaceful coexistence.

দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি বোধসম্পন্ন মানুষের মধ্যে যে সমগ্র পৃথিবীকে আত্মীয়তার একসূত্রে গ্রথিতকরণের ; জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জড়, অজড় নির্বিশেষে একের সাথে অন্যে যুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী পরিবার রূপে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের ভাবনা রয়েছে, তার এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো-"এক পরিবার এক পৃথিবী, এক ভবিষ্যৎ" গড়ে তোলা। এই ভাবনার মূল প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত এবং বিশ্বব্যাপী ঐক্য, শান্তি এবং সম্প্রীতির বোধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঐ আদর্শের স্থাপনা সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই সম্প্রীতি বা সমন্বয়ের ভাবনা শুধু মানুষের সাথে মানুষের নয়, মানুষের সাথে অ-মানুষ শ্রেণী সহ প্রকৃতি তথা পরিবেশেরও বটে এবং এই বিষয়ে যোগ-এর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে

তা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ২০২৩ সালে পালিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম ছিল "বসুধৈব কটুশ্বকম"-এর ভিত্তিরূপে যোগ। এই "বসুধৈব কটুশ্বকম" একটি খণ্ডবাক্য এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্যে সমগ্র বাক্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন

"অয়ং নিজঃ পররেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

উদারচরিতানাম্ তু বসুধৈব কটুশ্বকম॥"^১

অর্থাৎ ক্ষুদ্রমনা, স্বার্থপর মানুষ শুধুমাত্র ভেদ-ভাব করে এবং 'এটি আমার', 'ওটি অন্যের'- এই মানসিকতার বশবর্তী হয়ে নিজের চারপাশে সংকীর্ণতার প্রাচীর গড়ে তোলে, যা তাকে এই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উদার চেতনায় সমৃদ্ধ, তার কাছে সমগ্র পৃথিবী একই পরিবারভূক্ত-সকলেই তার পরম আত্মীয়সম। বস্তুতপক্ষে এই ভাবনার সাথে যেমন সম্পৃক্ত হয়ে আছে সহমর্মীতার ধারণা, তেমনি রয়েছে কর্তব্য এবং দায়বদ্ধতার অনুভব। বিষয়টি সামান্য প্রাঞ্জল করে বলা যায়, প্রতিটি মানুষ যদি আন্তরিকতার সাথে উপলব্ধি করে যে তারা পরস্পরের সাথে গভীর এক আত্মিক বন্ধনে যুক্ত আছে, তাহলে অন্যের প্রতি তার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে, যা পারস্পারিক ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং নাশকতামূলক মনোভাব-কে অতিক্রম করে, যে কোন বিভেদের সংকীর্ণতাকে বিনষ্ট করে বিশ্বমানবতার উদ্ভব ঘটাবে, যে বিশ্বমানবতা ধীরে ধীরে স্পর্শ করবে বিশ্বাত্মার বোধ-কে। অর্থাৎ "বসুধৈব কটুশ্বকম"- এই বোধের জন্য প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধির স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় - "বিশ্ব সাথে যোগে সেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো"^২ (Ref.....।।) অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ধূলিকণার সাথেও আমি এক অনিবার্য, অবশ্যস্ববতার সম্পর্কে বাঁধা পড়ে আছি-সে আমি চাই বা না চাই, তবে প্রয়োজন তাকে আত্মস্থ করা বা উপলব্ধি করা এবং এই উপলব্ধির পথ বা উপায় হলো 'যোগ'।

'যোগ' ভারতবর্ষের এক সুপ্রাচীন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, যা শুধুমাত্র ব্যক্তি বা সমাজ নয়, সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রযোজিত হয়ে চলেছে এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এর প্রসার তথা গ্রহণযোগ্যতা আজ সর্বজনসিদ্ধ। 'যোগ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে-

"যুঞ্জতে মন উত, যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য, বৃহতো বিপশ্চিতাঃ বি হোত্রো দধে বায়ুনাবিদ এক দন্মহি দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥"^৩

অর্থাৎ, হে মানব! যেভাবে গ্রহণ কিংবা দানকারী অর্থাৎ জ্ঞানাদি উত্তম বস্তুর আদান-প্রদানকারী (বিপ্রাঃ), বুদ্ধিমান যোগীগণ (বিপ্রস্য), বিশেষভাবে ব্যাপ্ত, বৃহৎ, অনন্ত বিদ্যাবান সমগ্র জগৎ-কে উৎপন্নকারী, সমগ্র জগৎকে প্রকাশকারী সেই পরমাত্মার-মধ্যে মননস্বরূপ মনকে যুক্ত করেন এবং ধিয়ঃ বা বুদ্ধিকে যুক্ত করেন আর যিনি প্রজ্ঞানকে আনয়নকারী, সহায়রহিতভাবে একাই সমগ্র জগৎকে রচনা করেন, যিনি অতীব প্রশংসার যোগ্য, যার স্তুতি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাঁর মধ্যে তোমরাও সেইভাবে আপন চিন্তাকে ধারণ করো।

অথর্ব বেদেও এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে

"অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পরযোধ্যা।

তস্যাং হিরন্ময়কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥"^৪

অর্থাৎ এই শরীররূপ নগরী সূর্যাদিদেবের অধিষ্ঠান-ভূত। আট চক্র এবং নয় ইন্দ্রিয় দ্বারা বিশিষ্ট এই নগরী অজেয়। এই নগরীতে এক প্রকাশময় কোষ আছে (মনোময় কোষ) যা আনন্দময় জ্যোতি দ্বারা আবৃত-সেটি স্বর্গাভিমুখী-বস্তুতঃ বেদে দেবপুরী বা স্বর্গলোক বলতে মূলত এই শরীরকেই বোঝানো হয়েছে।

তাৎপর্য হলো এই যে অজ্ঞান, দুর্বল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শরীরের গতিকে বোঝা সম্ভব নয়। অষ্টচক্র বলতে যোগের অষ্ট অঙ্গ অর্থাৎ যম নিয়মাদিকে বুঝতে হবে এবং নবদ্বার বলতে মস্তিষ্কের সাতটি ছিদ্র, মন

ও বুদ্ধিই গ্রাহ্য-এই নবদ্বারযুক্ত যে শরীর বা দেহ, তা অজেয়-ঐ শরীরে হিরণ্যময় যে কোষ বা মনোময় কোষ অর্থাৎ চেতন জীবাত্মা, তা স্বর্গসুখরূপ পরমাত্মার দিকে চলমান জ্যোতি বা প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে।

কঠোপনিষদে যোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয় ধারণাম্।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি, যোগো হি প্রভবাপ্যায়ৌ।।"^৫

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির অচঞ্চল অবস্থাকেই যোগ নামে অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্থিরভাব অবলম্বন করে, তখন সেই অবস্থাকে যোগীগণ যোগ বলে থাকেন। এই সময় সাধক সমস্ত জাগতিক বিষয় থেকে, যাবতীয় বিক্ষেপ থেকে মুক্ত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যেহেতু যোগের উদ্ভব ও ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে এবং যেহেতু যোগের ভঙ্গকাল আছে, সেহেতু সেই পরমাত্মাকে লাভের আগ্রহে যোগীকে নিরন্তর যোগযুক্ত থাকায় সচেষ্ট হতে হবে।

যোগসূত্র রচয়িতা মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ বলতে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই বুঝেছেন- "যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"।^৬ ব্যাখ্যা করে বলা যায় চিত্তের যাবতীয় বৃত্তির অবসান বা লয়-ই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে চিত্ত উৎকৃষ্টতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যিক, যোগ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'যুজ' ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় করে। এই 'যুজ' ধাতু সাধারণতঃ সংযোগ অর্থেই গৃহীত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে সমাধি অর্থ-ই গ্রাহ্য এবং এই সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত করাই যোগের চরম তথা পরম লক্ষ্য। ভাষ্যকার ব্যাসদেবের মতেও "যোগঃ সমাধিরিতি," তবে এই সমাধি লাভের জন্য প্রয়োজন চিত্তবৃত্তির নিরোধ, যা পতঞ্জলীর মতে যোগ। চিত্ত হলো মন, অহংকার ও বুদ্ধি- প্রকৃতির এই বিকার সমূহের একত্রীকরণ এবং এই তিনটিকে বিক্ষিপ্ত বা বিপথগামী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করাই যোগ। চিত্তবৃত্তি বিষয়ে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। বৃত্তির অর্থ পরিণাম অতএব চিত্তবৃত্তি বলতে চিত্তের পরিণাম বুঝতে হবে। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে বিষয়ের সাথে (ইন্দ্রিয়ের) সম্বন্ধবশতঃ চিত্তের (বিষয়াকারে) যে পরিণতি, তাই চিত্তবৃত্তি। পাতঞ্জল সূত্রের সমাধিপাদে পঞ্চপ্রকার চিত্তবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়- প্রমাণ বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি- "প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ"^৭

চিত্তের এই বৃত্তিগুলির মাধ্যমেই আত্মার বিষয়জ্ঞান হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত শুদ্ধ ও অপরিণামি হলেও গতিশীল তরঙ্গে প্রতিফলিত চন্দ্রকে যেমন গতিশীল মনে হয়, তেমনি আত্মাও চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে পরিণামী রূপে প্রতিভাত হ'ন। এই যে চিত্তবৃত্তি তা অবিদ্যাবশতঃ 'বা বিষয়কে যথাযথভাবে না জানার কারণেই উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে জীবের যাবতীয় দুঃখের উদ্ভব হয়-অর্থাৎ এই চিত্তবৃত্তিসমূহের প্রভাবেই জীব সংসারে আবদ্ধ হয়ে অশেষ দুঃখভোগ করে, যা নিরুদ্ধ করাই যোগ দর্শনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য সাধনের প্রধান দুটি উপায় হলো অভ্যাস ও বৈরাগ্য। কিন্তু অভ্যাসকরণের অধিকারী যাঁরা নন তাঁদের ক্ষেত্রে অষ্ট যোগাঙ্গ মার্গে অগ্রসর হবার নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে, যেগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্তের মালিন্যের অবসান হয় এবং তা প্রকৃত জ্ঞানের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই অষ্টাঙ্গ যোগ হলো- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি – "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাঙ্গানি"^৮

এগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি হলো বহিরঙ্গ সাধন-, যা মূল লক্ষ্য পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে। বহিরঙ্গ সাধনগুলির মধ্যে এই প্রবন্ধে যোগসাধনায় ব্রতী হওয়ার সংকল্পে নিজেকে প্রস্তুতিকরণের প্রাথমিক পর্যায়স্বরূপ 'যম' বিষয়ে আলোচিত হয়েছে এবং অন্য প্রসঙ্গগুলির সামান্য আগমন-প্রস্থান হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

অষ্ট যোগাঙ্গের অন্যতম প্রথম অঙ্গ 'যম'-এর অন্তর্ভুক্ত হলো অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। যোগদর্শন অনুসারে এই পাঁচটির অনুশীলন প্রতিটি মানুষের অন্তঃস্থিত যে দৈবী সত্তা-তার প্রকাশ ঘটায় এবং স্থান, কাল, জাতি ও নিয়মবিশেষের দ্বারা অবাধিত হওয়ায় সর্বদেশে, সর্বকালে যেকোন পরিস্থিতিতে এগুলি অবশ্য পালনীয়রূপে স্বীকৃত হয়।

পাতঞ্জল সূত্রে এ প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে-

"এতে জাতিদেশকাল সময়ানবচ্ছিন্নাং সার্বভৌমা মহাব্রতম" ^৯

অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ, কালও সময় কর্তৃক বিচ্ছিন্ন না হয়ে সর্বাবস্থায় সমানভাবে আচরিত হয়, তাহলে তাদের প্রতিটিকে মহাব্রত নামে অভিহিত করা যায়। বিষয়টি সামান্য স্পষ্ট করে বলা যায়, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় ব্যক্তি স্বীয় সুবিধা অনুসারে কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে এবং তা পালনের মাধ্যমে নিজেকে অহিংসকরূপে গণ্য করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অহিংসা বলতে নীতিগত ভাবে সর্ব বিষয়ে সর্বদা, সর্বভূতের প্রতি কারিক, বাচিক ও মানসিক- এই ত্রিবিধ হিংসা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহার কে বোঝায়। পাতঞ্জল সূত্রে বলা হয়েছে-

"বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা

লোভক্ৰোধমোহপূর্বিকা মৃদুমাধ্যাতিমাত্রা দুঃখজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষ ভাবনম"^{১০}

অর্থাৎ লোভ, ক্রোধ, মোহবশতঃই নিজের ইচ্ছাক্রমে বা অন্য কারো অনুরোধে বা নিজ অনুমোদনের দ্বারা হিংসা প্রভৃতি বিবিধ বিতর্ক সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই যে লোভ, মোহ এবং ক্রোধ, তা মৃদু, মধ্য বা উগ্রভাবে উৎপন্ন এবং তার ফলরূপ হিংসাও তেমন হয়-তবে এই হিংসা প্রভৃতি বিতর্কবৃত্তি যেভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন তারা দুঃখ, অজ্ঞান এবং উভয়ের অনন্ত ফল উৎপন্ন করে – এই ভাবে ভাবনার নাম প্রতিপক্ষ ভাবনা, যার বলবশতঃ হিংসাদি বিতর্কসমূহের দোষ অনুসন্ধানে সেইসব থেকে যেসব দুঃখ হয়, তাদের আলোচনায় যাবতীয় বিতর্কেরই নিবৃত্তি হয়। পূর্বের বক্তব্যের সূত্রে বলা যায়, বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ সুবিধা অনুসারে নিয়ম প্রস্তুত করে বলে থাকে যে সে শুধুমাত্র মৎস্যই আহার করে থাকে, অন্যথায় সে অহিংস -এ হলো জাতি দ্বারা সীমিত অহিংসা আবার কেউ দেশ দ্বারা সীমিত অহিংসার বশবর্তী হয়ে বলেন, আমি তীর্থস্থানে হিংসা করিনা; কাল দ্বারা সীমিত অহিংসার উদাহরণ, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা বা তিথি, নক্ষত্র বিচার সাপেক্ষে হিংসাত্মক আচরণ থেকে বিরত হওয়া প্রভৃতি। কিন্তু এই জাতীয় আচরণ প্রকৃত অর্থে অহিংসা বিধি পালন নয়। সূত্রে উক্ত আরো একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য -" স্বয়ং কোন হিংসাদি আচরণ না করে যদি তা অপরকে সাহায্যে সম্পাদিত হয় তাহলে সেটি কত হিংসা না হয়ে কারিত হিংসা হয় এবং অন্যে হিংসা করছে, একরূপ জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও ঐ হিংসাকারীকে যদি প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা অন্ততঃ না করা হয়, তাহলেও সেক্ষেত্রে অনুমোদিত হিংসা ঘটে। প্রসঙ্গতঃ শুধু অহিংসা নয়, যমের অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্গ নিয়মের ক্ষেত্রে এই একই বক্তব্য প্রযোজ্য। যেমন, 'সত্য' বিধিটির প্রেক্ষিতে স্বয়ং মিথ্যা কথন না করলেও, অন্যের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষী প্রদান বা মিথ্যাবাদীকে প্রশ্রয় দান - সমস্তই অন্যায় বা পাপজনক রূপে পরিগণিত হবে।

বস্তুতঃপক্ষে যম হলো নিষেধাত্মক বিধি এবং যোগ সাধনার প্রথম অঙ্গ কারণ যম পালনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির ভোগবাসনা তথা ইন্দ্রিয়াসক্তি দূর হয় এবং সে সংযত চিত্ত হয়। তবে, যোগী পুরুষগণ যেভাবে অহিংসা মহাব্রত পালন করেন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরূহ বা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত- যেমন অপকারী প্রাণীকে হত্যা করা, খাদ্যলাভের উদ্দেশ্যে ফসল কাটা, নিজের জীবন রক্ষার নিমিত্ত অন্যের প্রাণ হরণ- এই সমস্ত তা হিংসারই অন্তর্ভূত, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়েও বহু জীবাবুর প্রাণনাশ ঘটছে, এমন কি বলা হয়েছে, গৃহস্থের বাড়িতে অসময়ে, অনাহৃত ভাবে প্রবেশ করে যে অন্নগ্রহণ, তাও ঐ গৃহস্থের প্রতি এক জাতীয় পীড়ন, এই আশংকার সমাধানে বলা যায়, বিষয়টিকে এইভাবে বুঝতে হবে আবশ্যিকভাবে কিছু হিংসা ত্যাগ না করা গেলেও যথাসম্ভব হিংসা বর্জনের সংকল্পের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধ করা সম্ভব। বাস্তবিকপক্ষে যম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের ভিত্তি এই অহিংসা, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এ প্রসঙ্গে বলেছেন- "যো উপাসনা কা আরম্ভ করণা চাহে উসকে লিয়ে ইয়েহি আরম্ভ হৈ, কি বহ কিসীসে বৈর ন রখে, সর্বদা সব সে প্রীতি করে"^{১১}। সেই কারণে অহিংসা অভ্যাস না করে যদি সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি অনুশীলন করা হয়, তাহলে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন শারীরিক আঘাত করা থেকে বিরত থাকাই যে অহিংসা এমন নয় বরং সর্বপ্রকারে, সর্বদা, সর্বভূতের প্রতি পীড়নবুদ্ধির অভাব-ই অহিংসা, অর্থাৎ শুধুমাত্র শারীরিক নয় মানসিক বা বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমেও অন্যের অনিষ্ট সাধনের প্রচেষ্টা করা যাবে না। তবে এগুলি হলো অহিংসার প্রেক্ষিতে

নিষেধাত্মক বিধি; সদর্থক ভাবনা হলো সমস্ত প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব বা সম্ভাবপোষণ- ব্যক্তির সুখে ঈর্ষান্বিত না হয়ে তার প্রতি সৌহার্দের মনোভাব এবং দুঃখী ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা বোধ।

যোগদর্শনে সত্যকেও ব্রতের অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে ব্যক্তি যেমনভাবে তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন, সেইভাবে তা অপরকে জানালে বা জানানোর প্রবৃত্তি থাকলে তা সত্য রূপে গণ্য হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বরণে রাখা আবশ্যিক যে কোন ব্যক্তির সত্যকথনের উদ্দেশ্য যদি শ্রোতার ক্ষতিসাধন হয় তখন তা আর রূপে সত্যরূপে পরিগণিত হবে না। সুতরাং যে বাক্য অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে তার উপকার করে, তাকেই সর্বার্থে সত্য বলা যাবে। আর যে সত্যবাক্য অপরের পক্ষে অমঙ্গলজনক হয়, তা সত্য হলেও পাপ উৎপন্ন করে এবং বক্তা সেই ফলভোগ করে।

পরবর্তী ব্রত অস্তেয় বা, অবৈধভাবে অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত হওয়া বা চৌর্য্যবৃত্তিতে নিয়োজিত না হওয়া। সরলভাবে বলা যায়, যা আমার নয়, তার প্রতি আসক্তি বা তাকে লাভ করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকাই অস্তেয়। এক্ষেত্রেও শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থ গ্রাহ্য নয়- অর্থাৎ কেবল কৌশলপূর্ব্বক অপরের দ্রব্য হস্তগত করাই যে চুরি বা স্তেয়, তা নয়; মনে মনে অপরের বিষয়কে আকাঙ্ক্ষা করাও একজাতীয় চৌর্য্যবৃত্তি বা স্তেয়, অতএব, মানসিকভাবেও পরের দ্রব্যের প্রতি বাসনা বা লিপ্সা দূর করা প্রয়োজন কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? সংযমের মাধ্যমে। যোগের যে অন্তরঙ্গ সাধন-ধারণা, ধ্যান, সমাধি তাদের একত্রে সংযম বলা হয়- "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ"^{১২}। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, পার্থিব কিংবা অপার্থির কোন বস্তুতে বা বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সম্মিলিত প্রয়োগ-ই সংযম। আজকের পৃথিবী যে কদর্য হানাহানি, হিংসা ও দ্বেষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত, তার মূলে আছে এই সংযমের অভাব, সংযম আত্মীকরণের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞানময়ী পরমা বুদ্ধির স্ফুরণ ঘটে, যার প্রভাবে অসাধ্য কর্মের সাধন-ও সম্ভব হয়। এই সংযম লাভের অন্যতম উপায় ব্রহ্মচর্য্য, যার প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ, এই আচরণ শরীর ও মনের পবিত্রতাকে নির্দেশ করে- যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযত করে অল্প আহার, অল্প নিদ্রার বিধান দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মচর্য্যে। শরীর, মন ও বাক্যে বীর্য্য ধারণাই হলো ব্রহ্মচর্য্য এবং তা সম্ভব অপরিগ্রহ ব্রত অনুশীলনের মাধ্যমে। মহর্ষি পতঞ্জলি অনুসরণেই বলা যায় দেহ বা প্রাণ রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত যাবতীয় ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বর্জনের প্রচেষ্টা এবং অন্যের দ্বারা প্রদত্ত দানের অগ্রহণের মাধ্যমেই এই অপরিগ্রহ ব্রতের অনুশীলন সম্ভব। এর ফলে ব্যক্তির আত্মবিষয়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের জন্মকথন্তার যথার্থ জ্ঞান হয় এবং বিষয়ের প্রতি মোহ-বাসনা দূরীভূত হয়। অর্থাৎ এই অপরিগ্রহের মাধ্যমেই চিত্তে বৈরাগ্যের বীজ উদ্ভূত হয়। তবে মনকে এইভাবে যাবতীয় বিষয় আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রত্যাহার করার উপায় তত্ত্বগতভাবে জ্ঞাত হলেও বাস্তবতঃ তা সহজ কথা নয়। শ্রীমদ্ভগদগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে অর্জুন হতাশাগ্রস্ত হয়ে বলেছিলেন "হে মধুসূদন, মন অতি চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক, ইহাকে বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত করা অতিশয় কঠিন। সেই কারণে উহার নিরোধ আকাশস্থ বায়ুকে পাত্র বিশেষে আবদ্ধ করার ন্যায় দুঃসাধ্য মনে করি।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যোবায়োরিব সুদুষ্করম"।^{১৩}

অর্জুনের এই উক্তি মনে হয় আপামর সাধারণ মানুষের মনের কথা এবং উত্তরটিও জানা তাই সব যুগের সব মানুষের ক্ষেত্রেই অতীব প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে মন-কে সংযত করার উপায় নির্দেশ করে বললেন – "হে মহাবাহো মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা নিগৃহীত হয়ে থাকে"

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।”^{১৪}

এবং বারবার মনঃসংমমের চেষ্টা করে বিফল হলেও হতাশ হবার কোন কারণ নেই কারণ তা দুরূহ কিন্তু অসম্ভব নয়। প্রয়োজন যে সব বিষয় আমাদের ইচ্ছেশক্তিকে দুর্বল করে সেগুলি বর্জনের চেষ্টা করে অনুকূল কারণ গুলোর সাহায্যে মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা। বস্তুতঃ মন-ই হলো ব্যক্তির মধ্যে সুবৃত্তি ও কুবৃত্তি তৈরী হবার অন্যতম প্রধান কারণ। সুবৃত্তি মানুষকে উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত করে, আর কুবৃত্তি মানুষের মধ্যে হিংসা ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি যাবতীয় নেতিবাচক মনোবৃত্তির উদ্ভব ঘটায়- যার ফলস্বরূপ ব্যক্তির নিজের চরিত্রগত অধঃপতন তো হয়-ই, একই সাথে তাঁদের অনৈতিক আচার-আচরনে মানব সমাজের ভারসাম্য-ও বিঘ্নিত হয়। যোগদর্শনে মনকে নিয়ন্ত্রিত তথা স্বস্থ করার আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলা হয়েছে, ব্যক্তির শরীরে যে অসীম শক্তি বর্তমান, তার কেন্দ্রগুলিকে সপ্তচক্র বা কুণ্ডলিনী চক্র বলা হয়। এই চক্রগুলি সাধারণভাবে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং নির্দিষ্ট যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে তাদের জাগ্রত করা সম্ভব। এই সাতটি চক্র ও তাদের অবস্থান যথাক্রমে

১. মূলাধার চক্র যা পায়ুদ্বারে অবস্থিত
২. স্বাধিষ্ঠান চক্র যা নাভিদেশে অবস্থিত
৩. মনিপুরি চক্র যা পাকস্থলীতে অবস্থিত
৪. চক্র যা হৃদয়ে অবস্থিত
৫. বিশুদ্ধি চক্র যা গ্রীবদেশে অবস্থিত
৬. আঞ্জা চক্র যা কপালে অবস্থিত
৭. সহস্রার চক্র যা কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কে অবস্থিত

এর মধ্যে মূলাধার চক্রটির শক্তিই কেবল কিছুমাত্রায় উন্মুক্ত থাকে। অন্যান্য চক্রগুলির সুপ্ত শক্তি যদি কোন-ভাবে জেগে ওঠে তাহলে মন ও শরীরের ভারসাম্য- বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়, কারণ সাধারণ অবস্থায় মনের পক্ষে ঐ বিপুল শক্তিকে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়- যে কারণে মূলাধার চক্রের শক্তি সামান্য উন্মুক্ত থাকার কামাসক্ত মানুষ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নানাবিধ অপকর্ম সম্পাদনে-ও দ্বিধান্বিত হয় না। সেক্ষেত্রে সমগ্র শক্তির জাগরণে বিপর্যয় ঘটে যাবে। ধ্যান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শক্তিগুলি জাগানো সম্ভব কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনের নিয়ন্ত্রণ বা মনঃসংযম, যার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ব্যক্তি ঐ শক্তির অপব্যবহার না করে বরং তা সামাজিক মঙ্গল সাধনে প্রয়োগ করবে। এবং তা নিরন্তর অভ্যাসের মাধ্যমেই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় –“অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যেকোনো দিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই যাবে। মন হলো ধোপাঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাবে, সেই রঙে ছোবাবে, সেই রঙ হয়ে যাবে”^{১৫}। আসলে বাসনাগুলোর মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে, কারণ তা যাওয়ার নয়। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, যতদিন এই বাসনাগুলি সংসার এবং তার বিষয়কেন্দ্রিক হয়, ততদিন তারা শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, কিন্তু যখন তাদের মোড় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন তারাই অতি প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়- এই ভাবনাও শ্রীরামকৃষ্ণের। এই যে ভাবনার মোড় ঘোরানো-অন্যের সুখে হিংসাবাপন্ন না হয়ে সুখের বোধ হওয়া, তখনই তো তার সাথে মিত্রতা সম্ভব-সেখানে ঈর্ষার পরিবর্তে শান্তি বিরাজ করে। হৃদয়ের এই উদারতা অন্য ব্যক্তির প্রতি এক সক্রিয় সহমর্মীতার ভাবের উদ্ভব ঘটায়, স্বার্থগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশালতার সাথে আমাদের যোগসাধন হয়। বাস্তবিকপক্ষে জীবনচর্য্যার মধ্যে যদি উদারতা থাকে, সম্প্রীতি থাকে, সহানুভূতি থাকে, যা যোগের অনুশীলনের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব-তাহলেই দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম নিরপেক্ষভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, মাৎস্যর্থ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে পারস্পরিক সহাবস্থানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার উদ্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ একটি বিমূর্ত ধারণামাত্র, যা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে মানুষকে কেন্দ্র করে, মানুষের দ্বারা, মানুষের মঙ্গলার্থেই এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সর্বদাই তমসা থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করে ব্যক্তিকে করে তোলে আত্মশক্তিতে বলীয়ান। এই আত্মশক্তি অর্জনের মাধ্যম অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন বা অভ্যাস, যার ফলস্বরূপ চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়ে তা দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ আকার ধারণ করে এবং ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র স্বার্থ অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বার্থে, সার্বিক কল্যাণ সাধক সচেতন প্রচেষ্টার সাথে জীবন ধারণ তথা যাপনের প্রকৃত সন্তুষ্টি অনুভব করে।

তথ্যসূত্র

১. সৃষ্টি রত্নমালা চানক্য শ্লোক- ২৩ সংখ্যক
২. অষ্টমখণ্ড ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, গীতাঞ্জলি ৮৭, পৃষ্ঠা- ৩৮৩
৩. ঋগ্বেদ- ৫.৮১.১.
৪. অথর্ববেদ- ১০.২.৩১
৫. কঠোপনিষদ- ২.৩.১১
৬. যোগসূত্র, সমাধিপাদ- ২
৭. তদেব-১/৬
৮. তদেব- ২/২৯
৯. তদেব- ২/৩১
১০. তদেব-২/৩৪
১১. সত্যার্থ প্রকাশ, সপ্তম সমুল্লাস- পৃষ্ঠা- ১৬৫
১২. যোগসূত্র ৩/৪
১৩. শ্রীমদ্ভগবৎগীতা- ৬/৩৪
১৪. তদেব- ৬/৩৫
১৫. রামকৃষ্ণ কথামৃত-৪/২০/৩